



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 206 - 212

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

গুণময় মান্নার ‘শালবনি’ উপন্যাসে নকশাল প্রসঙ্গ

অনিন্দিতা দাস

গবেষিকা, Biodiversity and Environmental Studies (Midnapore City College)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: aninditavudas@gmail.com

ORCID ID 0009-0009-8028-7219

Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Naxalbari,
Jotdar,
Communist
Party,
Elimination of
Class Enemies,
Subordination,
Repression,
Oppression of
Women.

Abstract

Gunamoy Manna (1925–2010), one of the most prominent writers of post-Partition Bengali literature, vividly portrayed the lives of the lower-class people, the struggles of farmers and the working class to sustain their existence, and various mass movements in India through his keen observation. His writings not only depict the external realities of ordinary people but also explore the deeper dimensions of human life, bringing out its essential truths. He embodied these themes in his literary works by drawing upon the realities of his time, society, and the lives of common people. As a socially conscious writer committed to portraying the experiences of the working class, Manna's novels depict struggles for social justice and mass liberation, including the peasant movement, the Tebhaga movement, and the Naxal movement. The Naxal movement occupies a significant place in the history of socio-political movements in India. It originated in the village of Naxalbari, located in the Siliguri subdivision of the Darjeeling district of West Bengal. The movement, which began in March 1967, gradually spread across India. Its principal leaders included Charu Majumdar, Kanu Sanyal, and Sushital Roychowdhury. The Naxal movement has inspired numerous literary works by Bengali writers. Notable among them are Samarendra Bose, Samarendra Majumdar, Shaibal Mitra, Santosh Kumar Ghosh, Mahasweta Devi, Swarna Mitra, Bani Bose, Amar Mitra, and Ashok Kumar Mukherjee. This research paper analyzes the violent and turbulent socio-political conditions, the government's policy of repression, and the oppression of women as depicted in the novel *Shalbani*, which is centered on the Naxal movement.

Discussion

যুগ যুগ ধরে শোষিত ও নিপীড়িত হওয়া কৃষক সমাজ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে। সামাজিক শোষণ আধিপত্যের বিরুদ্ধে তারা ঘোষণা করেছিল বিদ্রোহ। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও তার বীজ সুপ্ত অবস্থায় ছিল তারও বহু আগে। স্বাধীন ভারতে তখন নানা কারণে কোন না কোন বিষয়কে নিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে আন্দোলন সংগঠিত হয়ে চলেছে। তার মধ্যে কোন আন্দোলন বৃহত্তর আকার ধারণ করেছে, আবার কোন আন্দোলন সরকারের কঠোর

দমননীতির ফলে তার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। সাতের দশকে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জেগে ওঠা নকশাল আন্দোলন যা পুরো ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

“নকশালবাড়ি শুধু একটি এলাকার নাম নয়, একটি রাজনীতির প্রতীক। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণে এর নাম একটি রাজনীতির সমার্থক হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছিল, এ দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও। ... নকশালবাড়ি সংগ্রামের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দুই ধারার অর্থাৎ বিপ্লবী ও সংশোধনবাদী ধারার মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস।”^১

১৯৬৫ সালে যখন সি.পি.আই ভেঙ্গে সি.পি.আই.(এম) নামে নতুন দল গঠিত হয় তাদের প্রতীক হয় কাস্তে, হাতুড়ি আর তারা। নতুন প্রতীক, নতুন কর্মসূচী ও গণতন্ত্রকে সামনে রেখে সি.পি.আই.(এম) ১৯৬৭ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু এবং ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোন্ডার। এই সময়কালে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। বাংলা কংগ্রেসের অঞ্চল প্রধান ঈশ্বর তির্কির ভাই নকশালবাড়ির জোতদার বুদ্ধিমান তির্কির অধীন ঠিকা প্রজা বিগল কিশাণকে ভাগচাষী বলে জমি থেকে উচ্ছেদ করে। বিগল কিশাণ এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মুনসেফ আদালতে মামলা করেন এবং বিগল কিশাণ মামলা জিতে ডিক্রি নিয়ে (১৩ই এপ্রিল ১৯৬৭) জমিতে চাষ করতে গেলে জোতদার বুদ্ধিমান তির্কির লেঠেল বাহিনী ৬১ বছর বয়সী বিগল কিশানের উপর হামলা চালায় এবং মাথা ফাটিয়ে দেয়। আহত বিগল কিশাণকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং নকশালবাড়ি থানায় ডায়েরি করা হয়। ২৪শে মে ১৯৯২ সালের ‘আজকাল’ পত্রিকা থেকে জানা যায় বিগল কিশানের সেই দিনের কথা -

“জোতদারদের গুন্ডাদের লাঠির ঘায়ে মাঠে পড়ে গেলাম। খবর রটে গেল জঙ্গলের নেতৃত্বে শয়ে শয়ে চাষী লাঠি হাতে রে রে করে এল। জোতদারের গুন্ডারা ভয়ে পালালো। জঙ্গল আমাকে লাঠির দাগ কেটে জমির দখল নিয়ে গেল। তখন জঙ্গলের নাম শুনেই জোতদারদের হাট অ্যাটাক হত। ঠিক হল জোতদারদের গ্রামে থাকতে দেব না। ...চারদিকেই জোতদাররা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাতে লাগল। আওয়াজ উঠল লাঙ্গল যার জমি তার।”^২

জোতদারদের স্বার্থে চাষীদের ধরতে পুলিশ এলে জনতা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ইঙ্গপেঙ্কির এর মৃত্যু হয়। ১৯৬৭ সালের উত্তরবঙ্গের নকশাল বাড়ির এই ঘটনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নকশালবাড়ির ভূমিহীনদের সঙ্গে জোতদারদের যে লড়াই, আন্দোলন প্রথমদিকে স্থানীয় স্তরে ছিল। পরে সি.পি.আই.(এম) এর মধ্যে যারা মাও-সে-তুং এর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী চারু মজুমদার (১৯১৯-১৯৭২), কানু সান্যাল (১৯৩২-২০১০), জঙ্গল সাঁওতাল (১৯২৫-১৯৮৮) প্রমুখ সদস্যদের সাহায্যেই এ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এদের বিশ্বাস ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যদিয়ে ক্ষমতা আরোহণ করা। এরা চেয়েছিল কৃষক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করতে। এদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শহরের শত শত তরুণ কৃষকদের সঙ্গে কাজ করার জন্য গ্রামে চলে আসে। নকশালবাদীদের মতে, ভারতের জনগণের চার ধরনের শত্রু (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সংশোধনবাদ, জমিদার শেণি এবং মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শেণি) রয়েছে এদের খতম করার মধ্য দিয়ে মাও-সে-তুং এর আদর্শিত পথে সমাজরাষ্ট্র গড়বে। চারু মজুমদার, কানু সান্যালরা মাও-সে-তুং এর আদর্শিত পথে চিন্তাধারা বা পদ্ধতি মত গেরিলা কায়দায় বিপ্লবের কথা বলে এবং নতুন পার্টি গড়ার কথা বলে। ১৯৬৮ সালে সি.পি.আই.(এম) ভেঙ্গে গঠিত হল সি.পি.আই.(এম)এল নামে বামপন্থী দল। এই নবগঠিত তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ নকশালপন্থীরা বেছে নিল ব্যক্তিহত্যার পথ। ডাক দিল গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার, মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার। কিন্তু শেষমেষ নকশালপন্থীদের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। কারণ গ্রামাঞ্চলের থেকে এই আন্দোলন যখন শহরাঞ্চলে এসে উপস্থিত হয় তখন থেকে এই আন্দোলনের ভাঙনের সূচনা হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে দূরদর্শিতার অভাবে এই আন্দোলন নিয়ে শহরাঞ্চলের দিকে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এই বিভ্রান্তি বিতর্ক বিভাজন নকশাল আন্দোলনের সফলতার সম্ভাবনাকে কিছুটা কমিয়ে দেয়। তবুও এই নকশাল আন্দোলন ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় একথা স্বীকার্য। গুণময় মান্নার সাহিত্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন না কোনভাবে জড়িত। বিশেষ করে শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, কৃষকদের দুরবস্থা, শ্রমিক শ্রেণীর কথা নিয়েই তার বেশিরভাগ সাহিত্য রচিত। তিনি নিজেই বলেছেন -

“আমার প্রধান উপন্যাসগুলো কৃষক শ্রমিক বিশেষত কৃষকদের নিয়েই লিখিত।”^৩

গুণময় মান্নার লেখালেখির সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে তিনি যা লিখেছেন তাতেই মননশীল পাঠক সমাজ ঋদ্ধ হয়েছে। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস ‘লখীন্দর দিগার’ (১৯৫০) এরপর তিনি একে একে লিখেছেন ‘কটা ভানারি’ (১৯৬০), ‘জননী’ (১৯৬২), ‘জুনাপুর স্টিল’ (দুই খন্ড) পূর্ব খণ্ড (১৯৬০), উত্তর খন্ড (১৯৬২), ‘বিদ্ব বিহঙ্গম’ (১৯৬৬), ‘অসামাজিক’ (১৯৭২), ‘শালবনি’ (১৯৭৮), ‘পঞ্চকৌণিক’ (১৯৮৯), ‘মুটে’ (১৯৯২), ‘ঘরান’ (১৯৯৭), ‘বিদ্রোহী স্বর’ (১৯৯৯), ‘গঙ্গা প্রবাহিনী’ (২০০৬), ইত্যাদি। এর মধ্যে শালবনি উপন্যাস নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা। চাঁদসোল গ্রামে ছদ্মবেশে আসা নকশালরা কিভাবে শ্রেণীশত্রু খতমের লীলায় মেতে উঠেছিল এবং তাদের শেষ পরিণতির চিত্র উপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয় নকশালদের সাহায্যকারী নারীরাও কিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে নিপীড়িত হচ্ছে তার করুণ চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

‘শালবনি’ উপন্যাস শুরু হয়েছে সিং বাবুদের পুকুরে মাছ ধরার বর্ণনা দিয়ে। সিং বাবু ওরফে গণপতি সিং চাঁদসোল গ্রামের জমিদার, যাকে একসময় হত্যা করেছে মোহন দুলে নামক একজন ছেলে। এই মোহন দুলের পরিচয় আমরা পাই উপন্যাসের চল্লিশতম অধ্যায়ে। তার আগে লেখক আমাদের সামনে মোহনের পরিচয় সম্পূর্ণ আড়াল করেছেন। ষাট ও সত্তর দশকের ইতিহাস থেকে জানা যায়, কৃষকদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে ও শ্রেণীশত্রু খতমের কাজটি করতে এগিয়ে এসেছিল তরুণ সমাজ। বিশেষত শহরাঞ্চলের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, এই উপন্যাসের নায়ক মোহন তাদের মধ্যে একজন। জমিদার গণপতি সিং এর হত্যাকারী মোহন এটা তার প্রকৃত নাম নয়, ছদ্মনাম। আসল নাম অমলেশ চ্যাটার্জী। লেখক নায়কের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন উপন্যাসের ঘূর্ণি অংশে ক্যাপ্টেন নারীন্দর সিনহার মুখ দিয়ে -

“অমলেশ চ্যাটার্জী, সান অব হরদেব চ্যাটার্জী, এ স্কুলটিচার অব চান্ডারনাগোর, ইউ আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট অব প্রেসিডেন্সি কলেজ ফিজিক্স অনার্স পার্ট ওয়ান ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট, সিঙ্গ লেফ্ট ইন দ্য থার্ড ইয়া... ডু ইউ অ্যাডমিট?”^৪

প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিক্স অনার্সের ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট অমলেশ চ্যাটার্জী গ্রামে এসেছে মোহন দুলের ছদ্মবেশে; উদ্দেশ্য শ্রেণীশত্রু খতম অর্থাৎ জমিদার জোতদারদের নিধন করা। গ্রামে সে আশ্রয় নিয়েছে গাজন দুলের শালীর ছেলের পরিচয়ে। বুড়ো গাজনের বউয়ের কোন ছেলেপিলে ছিল না। মাস দেড়েক আগে বউ মারা গেছে। তারই বাড়িতে এসে উঠেছে মোহন। এখন মোহনই গাজন দুলের বিধবা চারেক জমির মালিক। সকাল থেকেই সে মাঠের কাজ শুরু করে দেয়। গ্রামে এসে সে শুধু গ্রামের ভাষাই রপ্ত করেনি, চাষবাসের কাজও রপ্ত করেছে দস্তুরমতো।

শালবনির পাশাপাশি চাঁদসোল গ্রামে সাঁওতাল, বাগদী, দুলে, মাহাতোদের বাস। এই গ্রামেরই জমিদার গণপতি সিং এর ‘অল্পপূর্ণা রাইস মিল’-এ কাজ করে এরা। কেউ কেউ চাষাবাদ করে, মেয়েরা ধান সেদ্ধ ধান শুকনো করে, কোন কোন মেয়ে তার বাড়ির কাজ করে। গ্রামের মেয়েরা জঙ্গল থেকে কাঠকুড়িয়ে, জঙ্গলের বনকুঁদরি, পুকুরের গঁড়ি গুগলি, কলমি শাক তুলে নিজেদের পেট চালায় এবং নারী পুরুষ উভয়েই চাষ আবাদে কাজে হাত লাগায়। এদের মধ্যে কারও নিজস্ব জমি আছে, কেউবা ভাগচাষী। ভারতবর্ষ কৃষিপ্ৰধান দেশ হওয়ায় কৃষকের সংখ্যাই বেশি। তাই আমাদের দেশে কৃষকদের অধিকারের স্বার্থে কৃষক আন্দোলনকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল একমাত্র নকশালবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ফলশ্রুতিতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহুরে ছাত্র যুবকরা গ্রামে গিয়েছিলেন। বিপ্লবের স্বপ্নকে সার্থক করতে প্রাণ দিয়েছিলেন অনেকে। সত্তর এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার কাজে বাঁপিয়ে পড়েছিলেন তারা। তেভাগা আন্দোলনের পর এত বড় ধাক্কা ভারতীয় রাজনীতিতে আর আসেনি। এই আন্দোলন নাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী মার্কসীয় সংসদীয় রাজনীতির তত্ত্বকে, ধাক্কা মেরেছিল সমাজ ও অর্থনীতির ধ্বসে পড়া প্রাচীরে। জাগিয়ে তুলেছিল দিন বদলের প্রত্যাশা। ‘শালবনি’ উপন্যাসের মোহন সেই স্বপ্ন দেখা যুবকদের প্রতিনিধি। তাই সে শহর ছেড়ে গ্রামে এসেছে, কৃষক জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে সুন্দরভাবে। তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রথম

আমরা দেখতে পাই জমিদার গণপতি সিংকে হত্যার মধ্য দিয়ে। মোহন ও তার তিনজন সঙ্গী মিলে গণপতিকে হত্যা করেছে। হত্যার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গণপতির প্রশ্নের উত্তরে তারা জানায় -

“ঠিক আমাদের শত্রু নও তুমি ব্যক্তিগতভাবে। তুমি সমাজের শত্রু, তুমি জেঁক, কেবলই রক্ত শোষণ করেছে। তুমি মহাজন, তুমি সুদখোর, তুমি চালানী, তোমার ডালপালা চারদিকে ছড়ানো শোষণের জাল মেলেছ ... তোমার জেঁকের প্রাণ, রক্ত শুষে মোটা হয়েছে, সেই রক্ত ঝরিয়ে দেবে আমরা।”^৫

এরপরই তারা ধান কাটা ঝকঝকে কাস্তেটা দিয়ে গণপতিকে হত্যা করে। জমিদারের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মোহনের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মোহনের মতো নকশালবাদীরা এতটা গোপনে তাদের ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেত যা জানা সহজ ছিল না। শুধু দু-একটা চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন যার মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় মোহনের কিছু গোপন উদ্দেশ্য আছে। রাতের অন্ধকারে সবার আড়ালে ব্রাহ্মণভূঁইয়ার জঙ্গলের দিকে যাওয়া, বনা টুডুর কাছ থেকে তীর ছোঁড়ার কৌশল শেখা, কাস্তে দিয়ে মানুষের গলা কাটা যায় কিনা ইত্যাদি নানা অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ। মোহন গ্রামের এক ছেলেকে জিপ্সো করে -

“কাস্তে দিয়ে ছাগল কাটা যায়? মানুষের গলা? মানুষের গলা কাটতে হলে ঠিক কোনখানে লাগাতে হবে, ঘাড়ের দিকে, না কি সামনে গলনালীর দিকে, না কি পাশের দিকে?”^৬

নকশালদের উদ্দেশ্যই ছিল গোপন গোষ্ঠীর দ্বারা গোপনে জোতদারদের হত্যা করা যা গেরিলা অ্যাকশন নামে পরিচিত। এক একটা জমিদার খতম হলেই গ্রামের গরীব মানুষেরা সাহস পাবে। অন্যান্য গ্রামের জমিদাররাও ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাবে। গ্রামের মহাজনদের জমিদার জোতদারদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি কমতে থাকবে গরীবরা তাদের নিজস্ব মুক্ত অঞ্চল ফিরে পাবে এই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ‘শালবনি’ উপন্যাসেও দেখা যায় জমিদার গণপতির মৃত্যুতে অন্যান্য গ্রামের মালিকরা ভয়ে পালিয়ে যায়। সারা গ্রাম জুড়ে নিঃশ্বাসহীন অবস্থা। কেউ কাউকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সবাই যেন ভীত সন্ত্রস্ত। এদিকে শ্যামলীও মোহনকে সন্দেহের চোখে দেখে। তার কোথাও যেন মনে হয় মোহন পড়ালেখা জানা বাবু। মোহনের কর্মকাণ্ড জানতে সে মোহনের পিছু নেয়। এই পথে জমিদারের গোমস্তা তারক হালদারের সঙ্গে শ্যামলীর দেখা হয়। শ্যামলীর উপর প্রথম থেকে কুদৃষ্টি ছিল তারকের। এই তারকের মুখেই জমিদারকে সচেতন করার কথা প্রথম জানা যায় বারো নম্বর অধ্যায়ে -

“বাবু আপনাকে বললে আপনি রাগ করবেন। সেই অন্তরটো (চোরাই রাইফেল) লিয়ে লেন, আপনাকে বলা আমার কর্তব্য। ব্রাহ্মণ ভূঁইয়ার জঙ্গলের খবর জানেন? শুনলাম জঙ্গলের পাশ বরাবর মিলিটারির গাড়ি ঘোরাফেরা করে গেছে।”^৭

নকশালরা শ্রেণি শত্রুদের চিহ্নিত করে খতমের যে সংকল্প নিয়েছিল সে সম্পর্কে গণপতি ও কর্মচারীরা আগেই জানতো তাইতো তারক হালদার নিজেদের রক্ষার জন্য জমিদারকে চোরাই রাইফেল কিনে রাখতে বলে। আসলে সশস্ত্র নকশাল আন্দোলনের ফলে বাংলার গ্রামীণ জীবনে যে পরিবর্তনের আঁচ লেগেছিল তার ফলে গণপতির মতো প্রবল প্রতাপসম্পন্ন মহাজনরাও ভয় পেয়েছিল। গণপতির আগেকার প্রতাপ আর এখনকার গণপতির বর্ণনা পাই গ্রামের মহিলাদের মুখে -

“সিং বাবু মানুষট সি রকম আর নাই, আগে দেখলে মানুষজন দশ হাত ছিটকাই যেত ... লাল টকটক করছে মুখ ঘঁড়ায় করে শিকার করতে যাচ্ছে জঙ্গলে আর এখন সেই মানুষট বুড়া বলদ, নিজের হাতে খালুই নিয়ে পুখুরকে যাচ্ছে মাছ আগলাতে ছি ছি...”^৮

যে গণপতিকে দেখলে গ্রামের মানুষ দশ হাত দূরে সরে যেত, তারাই আজ তার পিছনে সমালোচনায় ব্যস্ত। গ্রামের মহিলারাও যেন তার কথা শুনেও না শোনার ভান করে আজ। আসলে নকশালদের দ্বারা ভীত হয়ে জমিদাররাও কোথাও না কোথাও তাদের প্রতাপ হারিয়েছে, গণপতির মতো জমিদাররাই তার দৃষ্টান্ত। গোমস্তা তারক হালদারেরও অবস্থা হয়েছিল এই জমিদারের মতো। শুধু তাকে নকশালদের হাতে মরতে হয়নি, সে নিজেই আত্মহত্যা করেছে। সে ছিল প্রচণ্ড নারী লোলুপ, যে যে মেয়ের উপর তার দৃষ্টি পড়েছে তারাই তাদের সতীত্ব হারিয়েছে। কেবলমাত্র শ্যামলী বাঁচতে পেরেছে তার বুদ্ধির জোরে। শ্যামলীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়। এই ঘটনার পর নকশালদের হাতে মরতে হবে; এই ভয়েই

হয়তো সে মৃত্যুকে সহজ পথ বলে বেছে নেয়। শ্যামলীর পরনের শাড়ি গলায় জড়িয়ে সে গাছের ডালে ঝুলে আত্মহত্যা করে। গ্রামের মহিলারা তাদের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করেনি উপন্যাসে, বরং তারা এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। এই স্বাভাবিকতা হয়তো নিশ্চিত জীবিকা থেকে চ্যুত হওয়ার ভয়ে। আসলে গ্রামের এই মানুষরা সমাজের অধীন শ্রেণীর প্রতিনিধি। তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত। তাদের জীবন বন, জমি ও শ্রমের উপর নির্ভরশীল। এই সকল অধীন মানুষরা অনেক সময় নিজের উপর হওয়া শোষণ সম্পর্কে সচেতন থাকলেও প্রতিবাদ করেনা বরং পরিস্থিতিতে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এর কারণ শুধু ভয় নয়, শাসকবর্গের দীর্ঘদিনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য। শাসক শ্রেণি শুধু বলপ্রয়োগ করে নয়, শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, আইন এবং সামাজিক রীতিনীতির মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে শোষিত মানুষ অন্যায়কে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে শুরু করে। এদের অন্তর্গত রক্তস্রোতের মধ্যেই যেন অধীনতার ধারণা প্রোথিত হয়ে আছে। তাইতো জমিদারের বদলে যাওয়া রূপ তাদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে। তারা জমিদারের পূর্বকার প্রতাপকে বেশি মান্যতা দিতে চায়। আন্তোনিও গ্রামশি এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে অধীনতার তত্ত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। সেদিক থেকে এই উপন্যাসের মূল চরিত্র শ্যামলী এক ব্যতিক্রমী চরিত্রের দৃষ্টান্ত। সবকিছু সহজে মেনে নেওয়ার পাত্রী সে নয়, তাইতো তারক হালদারকে সে প্রত্যাখান করতে পেরেছিল। সে যদি তারকের প্রস্তাব মেনে নিত তাহলে হয়তো সে নিশ্চিত ও স্বচ্ছল জীবন পেতে পারত। কিন্তু শ্যামলী তা করেনি। শ্যামলী একসময় মোহনের কাজে সাহায্য করেছে, মোহনকে বিবাহও করেছে। বিয়ের কিছুদিন পর মোহন আর শ্যামলী জঙ্গলের দিকে গেলে সেখানেই তারা ক্যাপ্টেন নারীন্দর সিং এর হাতে ধরা পড়ে। নারীন্দর সিং এর কথার মাধ্যমে মোহনের স্বরূপ, কার্যকলাপ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা জানতে পারি –

“মিস্টার চ্যাটার্জী, ইফ ইউ ডেন্ট মাইন্ড আপনার পার্সোন্যাল হিস্ট্রি আমাদের জানা, আপনি স্কুল থেকেই বিবেকানন্দের ভক্ত, খুব মরালিস্ট ছেলে, আই ওয়াভা, হাউ ডু ইউ রেকনসাইল বিবেকানন্দ উইথ ইউ লেলিন, অ মাও সে তুং এন্ড দিস ভায়লেন্স?”^{১৬}

নারীন্দর সিংয়ের মতো ব্যক্তির রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতার প্রতীক। যারা গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে নকশালদের নিধন করার উদ্দেশ্যে। এই ক্যাপ্টেনের গুলিতেই মোহনের মৃত্যু হয় শ্যামলীকে গণধর্ষণ করা হয়। লেখক মোহনের হত্যা ও শ্যামলীর ধর্ষণের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বল্পাস এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কার্যকলাপের যে মর্মান্তিক বর্ণনা তুলে ধরেছেন তা পাঠকের মনে ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার করে –

“ডান হাতের রিভলবার শূন্যে ছুঁড়ে আবার আগেকার মতো লুফে নিল নারীন্দর। রিভলবার তুলে তাক করল সে ‘আপনি দেখবেন আমার হাতের টিপ কেমন। আমার লোকেরা আপনার বাঁধন খুলে দেবে কারণ চেনড লায়নকে আমি শুট করতে চাই না’ ...তিনটি গুলি, খুলে দেবার পর আপনি যাই করুন, যেমন অবস্থায় থাকুন, প্রথমগুলি লাগবে আপনার বাঁদিকের উরুতে, ঠিক মাঝামাঝি, দ্বিতীয়টি লাগবে ডানদিকের চেষ্টে, আপনার জ্ঞান থাকবে তখনো বুঝবার, আমার হাতের টিপ ... আর ফাইন্যালি, না, বুক-হার্টে নয়, মাথায়, ঠিক কপালের উপর, থ্রু ইউ ব্রেন, ... ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিতে দ্রুত বাঁধন খুলে দিল মোহনের। সিংহের মতো গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল মোহন - হ্যাঁ ক্যাপ্টেনের দিকেই কিন্তু ওর চোখ পড়েছে গুহা ঘরের সামনে শ্যামলীর সেই সাজিয়ে রাখা নুড়িগুলোর উপর। ... ক্যাপ্টেনের তুলে ধরা অকম্প হাতে রিভলবারের নলটা এক আধ ইঞ্চি স্থান বদল করলে ওপর নিচে, এক সেকেন্ড পর পর, ওয়ান-টু-থ্রি। প্রথমে মোহনের ঝোড়ো বেগ পাথরে ধাক্কা খেলো যেন, দ্বিতীয়ে এর দেহটা শূন্যে টলে টলে উঠল, তৃতীয়ে আর এক পা সামনে এগিয়ে ও আধ পাক ঘুরে পড়ে গেল, সেই জড়ো করা নুড়িগুলোর উপর।”^{১৭}

এইভাবে নকশালদের নিধন চলছিল সারাদেশ জুড়ে। রাষ্ট্রশক্তির হাতে পড়ে বহু ছাত্র যুবকদের প্রাণ দিতে হয়েছিল। দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা কংগ্রেস নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে নকশাল আন্দোলন যদি সফলতা পায় তাহলে পশ্চিমবাংলার রাজনীতির পালাবদল ঘটবে। তাই ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ভারতীয় সেনাবাহিনী দিয়ে

নকশালদের সমূলে বিনাশ করলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ও নকশাল আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ও চরম দমনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের মেয়াদকালে তিনি পুলিশ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নকশাল আন্দোলনকে প্রায় সম্পূর্ণ নির্মূল বা অবদমিত করেন। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের শাসন আমলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে নকশালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ব্যাপক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। নকশাল আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদারের ‘শ্রেণি শত্রু খতম’ এর জবাবে তৎকালীন প্রশাসন নকশালপন্থী যুবকদের ওপর চরম দমনপীড়ন শুরু করে। বহু জায়গায় আধা-সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ যৌথ চিরুনি তল্লাশি অভিযান চালায়। তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলকালেই, ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে নকশাল আন্দোলনের প্রধান নেতা চারু মজুমদারকে কলকাতা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। লক-আপে বন্দি থাকা অবস্থাতেই চারু মজুমদারের মৃত্যু হয়, যা নকশাল আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় এবং আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন করে তোলে। হাজার হাজার নকশালপন্থী যুবক ও সন্দেহভাজনকে কোনো বিচার ছাড়াই বছরের পর বছর কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ও প্রেসিডেন্সি জেলসহ বিভিন্ন কারাগারে বন্দিদের ওপর চরম অমানবিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। এইভাবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে নকশালদের লড়াই চিরতরে মুছে যায়।

নকশাল আন্দোলনে যেসব মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের উপরেও অত্যাচার নেমে এসেছিল এমনকি নকশালদের পরিবারের লোকজন এবং মহিলাদের উপর চরম পুলিশি অত্যাচার নেমে আসে। সমরেশ মজুমদারের ‘কালবেলা’ উপন্যাসে নকশালপন্থী অনিমেষের প্রেমিকা মাধবীলতার উপর অমানবিক নির্যাতনের ছবি ফুটে ওঠে। তাকে পুলিশ ও পুলিশের সহযোগীদের লালসার শিকার হতে হয়েছিল। ‘শালবনি’ উপন্যাসে শ্যামলীর গণধর্ষণের ঘটনা সেরকমই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

“শান্ত কণ্ঠে ক্যাপ্টেন বলছিল, ‘পিছনে ঝোপের আড়ালে নিয়ে যাও, ওয়েল, একলা নয়, তিন জনেই একসঙ্গে যাও, আ সর্ট অব আ ওআইলড বিচ অ্যাজ শী ইজ... আদার্স অন্যদিকে মুখ ফেরাও... সুজন সিং তোমার দাবি আগে তোমাকেই ওই ছুঁড়ি বল্লম দিয়ে বিঁধেছিল, দেন রহমান এন্ড দেন গণেশ উইল ফলো ইউ... মুহূর্তে নির্দেশ পালিত হতে শুরু করল, শ্যামলীর চিৎকার বনটাকে কাঁপিয়ে তুলল যেন, তিনটে জন্তুর আক্রমণের মুখে একটা বিড়ালীর সমস্ত রোঁয়াগুলো ফুলে উঠেছে, সামনে কামড়াচ্ছে, কামড়াবার চেষ্টা করছে শ্যামলী, লাথি ছুঁড়েছে... সময় কাটছে, লম্বা সময় কাটছে অন্যদিকে - তার তাল পড়ছে ঝোপের পিছনে শ্যামলীর বদলে বদলে আসা কণ্ঠের শব্দে। উঁচু চিৎকার ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল, ‘মহন, মহন...’ ডাক বন্ধ হল, তারপর গোঙানি, সেটাও মাঝে মাঝে গলায় আটকে যায়, আবার বেরোতে থাকে। তারপর কিছুই শোনা যায় না।”^{২১}

শ্যামলীর গোঙানি সারা অরণ্য কাঁপিয়ে দিয়েছিল, যে অরণ্য তাদের জীবন ও জীবিকার উৎসস্থল। সেই অরণ্যের মধ্যে তাকে হতে হল ধর্মিত। এই অরণ্যবেষ্টিত বনভূমি যেখানে শালের সমারোহ, তা এই উপন্যাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই উপন্যাসে অরণ্য, আদিবাসী সমাজ ও নারীর জীবন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। তা আজ ক্ষমতাবানদের হাতে পড়ে নিঃশেষ হতে চলেছে। ফরেস্ট ইন্সপেক্টররা ঘুষ খেয়ে ব্যবসায়ী কল্ট্রাকটরদের দামী দামী কাঠ কাটার অনুমতি দিয়েছে। তাতেই অরণ্য হয়ে যাচ্ছে ফাঁকা। তেমনি ক্ষমতাবানদের হাতে পড়ে নারীরা হচ্ছে নিঃস্পেষিত। যেমন এই উপন্যাসের শ্যামলী, শ্যামলীর মা সহ গ্রামের অন্যান্য মহিলারা। প্রকৃতি ও নারীর উপর এই শোষণ ও আধিপত্য ইকোফেমিনিজম তত্ত্বের দিকটি নির্দেশ করে। ইকোফেমিনিজম নারী ও প্রকৃতির উপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শোষণের দিকটি তুলে ধরে। ১৯৭৪ সালে ফরাসি নারীবাদী লেখিকা ফ্রান্সোয়াজ দুবন (Françoise d'Eaubonne) তাঁর ‘Le Féminisme ou la Mort’ (নারীবাদ অথবা মৃত্যু) গ্রন্থে প্রথম ‘Ecofeminism’ শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে বিশ্বজুড়ে বন্দনা শিবা, মারিয়া মিজ এবং ক্যারোলিন মার্চেণ্টের মতো চিন্তাবিদ ও পরিবেশবাদীরা এই তত্ত্বকে আরও সমৃদ্ধ করেন।

নকশালবাদী আন্দোলনে মহিলারাও নকশালদের সহযোগী কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। তাদের জন্য রান্না করা, মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারীদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করা, আহত অসুস্থ নকশালদের সেবা করা, এমনকি অনেক মহিলারাও

তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এর ফলেই তাদের উপরে পাশবিক অত্যাচার নেমে এসেছিল। শ্যামলীর মতো অনেককে গণধর্ষিত হতে হয়েছিল। এইভাবে শাসক শ্রেণি শুধু শারীরিকভাবে নয় মানসিকভাবেও তাদের ভেতর থেকে ভেঙে দিয়েছিল। যা ছিল রাষ্ট্রের দমনমূলক নীতির এক কৌশল।

উপন্যাসে মোহনের মৃত্যু হলেও সে গ্রামের মানুষদের মধ্যে প্রতিবাদী সত্তার জন্ম দিতে পেরেছিল। মথুরকৌড়ি বনা টুড়ুদের মত লোকজনের মধ্যে তা নিহিত ছিল। জমিদারের জমিতে চাষ করা এবং পরক্ষণেই ধান তোলার সময় পুলিশ ও কৃষকের সংঘর্ষে অনেক কৃষক মারা যায়। তার দরুণ ক্যাম্পের দুজন পুলিশকে হত্যা করা হয়। সারা গ্রামে পুলিশের টহলদারি চলে পুলিশের গুলিতে মথুর কৌড়ির হত্যা এরকম নানাবিধ ঘটনা ঘটতে থাকে। এরই মাঝে শ্যামলী গর্ভজাত সন্তানের আগমন যা মোহনের রক্তের বীজ বহন করে চলেছে এই সন্তানই হবে নকশালপন্থী মোহনের ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা।

সত্তর দশককে মুক্তির দশক করার লক্ষ্যে নকশালরা আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিল। এই মুক্তির দশকেই মানুষে মানুষে হিংসা, লড়াই, সন্দেহ, মৃত্যুর মিছিল এবং বিদ্বেষের আগুনে এই আন্দোলন তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পথে পৌঁছতে পারেনি। রাষ্ট্রের কঠোর দমননীতির ফলে বহু নকশালকর্মী মারা যায় এমনকি তাদের পরিবার, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবরাও এই হিংসার কবলে মারা গিয়েছিল। উপন্যাসে একে একে শেষ হয়ে যায় মোহন, বলাই, মথুর কৌড়ি। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কোথাও আসায় বুক বেঁধেছেন মোহনের সন্তান জন্মের মধ্য দিয়ে। এ লড়াই চির প্রবাহমান। যা থেমে থাকার নয়। নতুন ভাবে নতুন কোন প্রেক্ষিতে এই আন্দোলনের স্ফূরণ ঘটবে। গুণময় মাল্লা তার ‘শালবনি’ উপন্যাসে নকশালদের দ্বারা শ্রেণী শত্রু খতমের রাজনীতি শুধু তুলে ধরেননি, তার পাশাপাশি সাতের দশকের নকশালদের পরিণতির একটা রূপরেখা অঙ্কন করেছেন।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, অমর, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন (কলকাতা : নয়া ইন্তেহার প্রকাশনী, তৃ-প্র ২০০২), পৃ. ৪০
২. মন্ডল, সেলিম বক্স, ‘সত্তরের রাজনৈতিক উপন্যাস’, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৭
৩. সামন্ত, সুবল, ‘গুণময় মাল্লা সংখ্য’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৮
৪. মাল্লা, গুণময়, ‘শালবনি’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৪০৩
৫. তদেব, পৃ. ৩১৫
৬. তদেব, পৃ. ৩০১
৭. তদেব, পৃ. ৩০৯
৮. তদেব, পৃ. ২৮২
৯. তদেব, পৃ. ৪০৪
১০. তদেব, পৃ. ৪০৭
১১. তদেব, পৃ. ৪০৬